এক.

লাইব্রেরির ধুলোমাখা ম্যাগাজিনে মাত্র দুটো শব্দ নিশাতের জীবনটাকে ওলটপালট করে দিল—'অকালমৃত্যু'।

পুরনো কাগজের গুমোট গন্ধে বাতাসটা কেমন ভারী হয়ে আছে। ছবির কোণে তাহিয়া হাসছে। পাশে একদল বন্ধু, সবার চোখে এক আকাশ স্বপ্ন। সেই হাসিমুখের নিচে ছোট কি লেখা—আমাদের ছেড়ে যাওয়া প্রিয় ছাত্রী তাহিয়ার স্মরণে। নিশাত ফিসফিস করে উঠল, 'অকালমৃত্যু? কিন্তু ম্যাম তো বললেন ও নিখোঁজ!'

লাইব্রেরির গভীর নীরবতায় কেউ কোনো উত্তর দিল না। বুকশেলফের আড়ালে ঘাপটি মেরে থাকা কোনো এক পুরনো অন্ধকার সত্য যেন হঠাৎ করে বেরিয়ে এলো। পাশের একটা ফাইলে পাওয়া গেল তাহিয়ার নামে একটা নোটিশ—'চরম অসদাচরণ'। সূত্রগুলো ঠিক মিলছে না। ঘটনাটা কেবল ভুল পথে পা বাড়ানোর ছিল না, এর পেছনে যে এমন ভয়াবহ এক পরিণতি লুকিয়ে ছিল, তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। নিশাত বুঝল, রিদিকে শুধু বুঝিয়ে ফেরানো যাবে না। ফারহানের তৈরি করা মিথ্যার মায়াজাল সরাতে হলে এমন এক জোরালো ধাক্কা দরকার, যা ওর মোহের দেয়াল এক নিমেষে ধসিয়ে দেবে।

ঠিক এই সময়েই নিশাতের মায়ের শরীরটা হঠাৎ ভেঙে পড়ল। হাসপাতালের সাদা দেয়ালগুলোর মাঝখানে মা শুয়ে আছেন নিস্তেজ হয়ে। করিডোরে ফিনাইলের তীব্র কটু গন্ধ, আর দূর থেকে ভেসে আসা হার্ট মনিটরের একটানা 'বিপ-বিপ' শব্দ। নিশাতের মনে হল ওর এতদিনের সাজানো পৃথিবীটা তাসের ভেঙে পড়ছে। তাহিয়ার মৃত্যু, ওই রহস্যময় নীল

ডায়েরি, আর রিদির একগুঁয়েমি—সবকিছুই এখন অর্থহীন মনে হচ্ছে। ও শুধু মায়ের বিবর্ণ হাতটা আঁকড়ে ধরতে চাইল।

নিশাত এখন আর শর্ত দিয়ে প্রার্থনা করে না। জায়নামাজে দাঁড়িয়ে ও শুধু ধৈর্য ধরার শক্তি চায়। দাদির সেই কথাটা এখন ওর একমাত্র সম্বল—'বিপদে ভেঙে না পড়াটাই সবচেয়ে বড় বন্দেগি।'

অন্যদিকে রিদি তখনও ফারহানের ঘোরে বন্দি।

সেদিন বিকেলে গলির মোড়ের ক্যাফেটাতে বসে ফারহান হঠাৎ রিদির চোখের দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বলল, 'টায়ারটা হঠাৎ নষ্ট হয়ে গেল রিদি। জানোই তো, বাইকের টায়ার চেঞ্জ না করলে কাল তোমাকে নিয়ে বেরোতে পারব না। পাঁচ হাজার টাকা দিতে পারবে প্লিজ? তুমিই তো আমার একমাত্র ভরসা।'

রিদি অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। 'টায়ার? কালও তো দেখলাম ঠিকই আছে!'

মুহূর্তেই ফারহানের চেহারা বদলে গেল। চোখের সেই কৃত্রিম কোমলতা উধাও। 'তুমি আমাকে জেরা করছ? ভালোবাসি বলেই তোমার কাছে চেয়েছি। এখন দেখছি তোমার কাছে ভালোবাসার চেয়ে টাকার দামই বেশি।'

রিদি অপরাধবোধে কুঁকড়ে যেতে শুরু করল। মনের কোণে তাহিয়ার ডায়েরির সেই 'ছায়া'র কথা একবার উঁকি দিলেও ওটা ঝেড়ে ফেলল। ফারহানের তৈরি করা মায়াজাল তখনও অনেক বেশি শক্তিশালী।

স্কুল ছুটির পর সুযোগ বুঝে ও নিশাতের ব্যাগ থেকে নীল ডায়েরিটা সরিয়ে নিল। নিজের পড়ার টেবিলের ড্রয়ারে ওটা তালাবদ্ধ করে রাখল। রিদি ভাবল, তাহিয়ার সেই কান্নার সুরটা চিরতরে আটকে দিতে পারলেই বুঝি ও মুক্তি পাবে।

ও জানত না—সত্যকে যত শক্ত করে চাপা দেওয়া হয়, তা তত বেশি ভয়ংকর হয়ে ফিরে আসে।

নিশাত তখন মায়ের জীবন-মৃত্যুর লড়াইয়ে এতটাই ডুবে ছিল যে, ব্যাগ থেকে ডায়েরিটা উধাও হওয়ার ব্যাপারটিও বুঝতে পারল না।

দুই.

অথচ মাত্র মাসখানেক আগেও নিশাতের পৃথিবীটা ছিল অন্যরকম। তখন মায়ের ফ্যাকাশে মুখটা ওর চোখে পড়ত না, চোখে পড়ত কেবল মোবাইলের ওই নীল আলো।

আয়নায় দাঁড়ালে ইদানীং নিজের প্রতিবিম্বকেই অচেনা লাগে ওর। গায়ের শ্যামলা রঙটা কেমন বিবর্ণ হয়ে গেছে। টানা একজোড়া চোখে সারাক্ষণ ক্লান্তি; যেন ভেতর থেকে কেউ ওর সবটুকু প্রাণশক্তি শুষে নিয়েছে। মা বলতেন, 'নিশাতের হাসিতে মায়া আছে।' অথচ সেই হাসিটা এখন কোথায় যেন মরে গেছে, নিশাত নিজেও জানে না। সেদিনও সে এক মনে মোবাইলের গেমস এ ডুবে ছিল। মা এসে পড়তে বসতে বললেন ওকে।

'আর পাঁচটা মিনিট, মা! জাস্ট এই লেভেলটা শেষ করি।'

নিশাতের গলায় মিনতি নয়, ছিল স্পষ্ট বিরক্তি। জানালার ওপাশে গোধূলির রক্তিম আকাশ যখন মেঘের মেলা বসিয়েছে, নিশাত তখন নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে মোবাইলের স্ক্রিনে। ওর আঙুলগুলো এক নেশাতুর ছন্দে নেচে চলেছে—ঠিক যেন কোনো মোহগ্রস্ত পতঙ্গ, যে জেনেশুনে আগুনের শিখায় ঝাঁপ দিচ্ছে।

'আর কোনো পাঁচ মিনিট হবে না, নিশাত। পড়ার বইগুলোতে ধুলোর পাহাড় জমেছে, দেখতে পাস না?'

মায়ের কণ্ঠ ছিল অস্বাভাবিক শান্ত। কিন্তু সেই নিস্তরঙ্গ স্বরের নিচে লুকিয়ে ছিল দীর্ঘদিনের এক গভীর ক্লান্তি। ফুরিয়ে আসা প্রদীপের শিখার মতো মায়ের অস্তিত্বটা দিনে দিনে ফিকে হয়ে আসছিল। কিন্তু সেই মলিনতা অনুভব

করার ক্ষমতা নিশাত তখন হারিয়ে ফেলেছিল। বাস্তবের সব অনুভূতি ওর কাছে পৌঁছানোর আগেই মোবাইলের ওই নীল আলোয় পুড়ে ছাই হয়ে যেত।

এক সময়ের চঞ্চল মেয়েটি তখন নীল কাচের বাক্সে বন্দি এক পাখি। পড়াশোনার বদলে ইউটিউব শর্টসের অতল গহ্বরে ও ঘণ্টার পর ঘণ্টা হারিয়ে যেত। বাইরের বাতাসে যখন গাছের পাতায় মোলায়েম সুর বাজে, নিশাতের মনে তখন শুধুই অস্থির হাহাকার।

স্কুলের ক্লাসরুমটাও ওর কাছে ছিল এক নীরব কারাগার। শিক্ষিকা যখন মন দিয়ে কিছু বোঝাতেন, নিশাতের মন পড়ে থাকত টেবিলের নিচে রাখা স্মার্টফোনটায়। ও শুধু টিফিনের অপেক্ষা করত কখন ভার্চুয়াল বন্ধুদের সাথে একটু মিশে যাবে।

সেদিন টিফিনেও তার ব্যতিক্রম হলো না। ক্লাসের শেষ বেঞ্চে গোল হয়ে বসে ছিল চার বান্ধবী—নিশাত, তানিয়া, রিদি আর আয়েশা। তানিয়া একটু ঠোঁটকাটা, অন্যদিকে রিদি আজকাল কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে থাকে।

তানিয়া ফিসফিস করে বলল, 'দেখলি তোরা? অঙ্কের স্যার যখন চশমাটা নাকের ডগায় নামিয়ে তাকান, মনে হয় এখনই টুপি থেকে খরগোশ বের করবেন!'

নিশাত হেসে উঠল। 'আরে না! বল, উনি ভিনগ্রহের কোনো জীব। আমাদের শয়তানি দেখে নিজেই ভড়কে যান।'

হাসির রোল পড়ে গেল চারদিকে। কিন্তু সেই আড্ডার মাঝেও রিদি বারবার ফোনের স্ক্রিনে তাকাচ্ছিল। ওর চোখেমুখে এক অদ্ভুত লাজুক আভা। নিশাত রিদির দিকে ঝুঁকে চোখ টিপে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার রিদি? কারও মেসেজের জন্য মন আনচান করছে নাকি?'

রিদি ফোনটা বুকের কাছে জড়িয়ে ধরল, যেন কোনো গোপন সম্পদ আড়াল করছে। 'আরে না তো! ফারহান ভাইয়া একটা দারুণ কবিতা পোস্ট করেছেন, সেটাই দেখছিলাম।'